স্রোতস্বিনী

শারদীয়া সংখ্যা

আশ্বিন ১৪২৮ • অক্টোবর ২০২১

সোতস্বিনী

সূচি

সম্পাদকীয়	১
আগমনীর আলো	২
৪ নং বেড	২
ক্ষীরের পুতুল	৩
অ্যাসাইলাম	৪
জাদু কথা	৪
সত্যজিৎ রায়	৫
স্মৃতিতে,জাগরণে: শতবর্ষে বিদ্রোহী	৬

স্রোতস্বিনী

সম্পাদকীয়

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজার আনন্দযজ্ঞে যেন পূর্ণাহুতি দান করে 'শারদীয়ার সংখ্যা'।দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে , এখনও আমরা করোনা অতিমারীর তাণ্ডব থেকে অব্যাহতি পাইনি। কিন্তু চিরকাল আমরা ভারতবর্ষের প্রাত:স্মরণীয় মহাপুরুষদের কাছ থেকে শোকে,দু:খে,বিপদে অবিচল থাকার শিক্ষা পেয়েছি।তাই এবার নরসিংহ দত্ত কলেজের বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা 'স্রোতস্বিনী' দেওয়াল পত্রিকার 'শারদীয়ার সংখ্যা' প্রকাশ করলাম।

শরৎবাণীর বীণা বেজে উঠেছে।আকাশে বাতাসে বিবিধ রাগ-রাগিনীতে আনন্দের সুরধ্বনি ঝঙ্কৃত হচ্ছে।শিউলি ও কাশফুলের গন্ধ স্বাগত জানাচ্ছে জগন্মাতাকে।শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি ঘোষনা করছে বিশ্বজননীর আগমনবার্তা।দিকে দিকে ফুটে উঠেছে বাঙালির মহোৎসবের প্রস্তুতির চিরন্তন চিত্র । মহোৎসব মানেই মিলন উৎসব।তাই 'শারদীয়ার সংখ্যা' প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের চিন্তা-ভাবনার ক্ষুদ্র পরিসরটুকু পাঠকের সাথে ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমাদের প্রকাশিত গল্প, প্রবন্ধ,ছবিগুলি পূজাবকাশে পাঠকের সঙ্গী হতে পারলে শ্রম সার্থক হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি মার্জনীয়।

ধন্যবাদান্তে

সুকল্যাণ মুখার্জী,জুহি পোদ্দার

জুহি পোদ্দার

আগমনীর আলো

বাংলায় শক্তিপূজার বাহুল্য বহুদিন যাবৎ বিদ্যমান।প্রাচীনকাল থেকেই জাতি,বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির দুর্গোৎসবে মেতে থাকার ছবি সুস্পষ্ট।সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম দক্ষিণাকালীর পূজা প্রচলন করেন। অনেকে রামপ্রসাদ সেনকে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের শিষ্য হিসেবে মনে করেন।এই নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতবিরোধ রয়েছে।তবে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সৃষ্ট দক্ষিণাকালীর তত্ত্বময়ী রূপকে এবং দশদিক ব্যাপ্ত দেবী দুর্গার তত্ত্বময়ী রূপকে ভাবময়ী করে তুলতে রামপ্রসাদ সেন,কমলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি শাক্তপদকর্তাদের ভূমিকা যে অনেকখানি সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই ।তাদের হাতধরেই শ্মশানবাসিনী দেবী কালিকা হয়ে উঠেছেন ঘরের মা, মেনকা ও গিরিরাজের কন্যা উমা হয়ে উঠেছেন বাঙালির ঘরের মেয়ে।
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিনী আদ্যাশক্তি,ব্রহ্মময়ী কখনো মেনকার কন্যা দ্বিভুজা অম্বিকা, কখনো ভূভার নাশিতে তিনি দশভুজা,আবার কখনো তিনি কালের করালগ্রাস থেকে উদ্ধারকারিনী কালী। কিন্তু বাঙালি মেয়েরা যেন মেনকার মত জগজ্জননীকে যোগমায়া ,করালবদনী প্রভৃতি বিশেষনে ভূষিত করতে চান না ।তারা মাকে উমারূপেই আপন হৃদয়ের অন্ত:স্থলে স্থান দিতে চান ।তাই তারাচাঁদ রায়ের পদে মেনকার অভিব্যক্তি-

¨করি অরি পরে আনিলে হে কারে কই গিরি মম নন্দিনী,

আমার অম্বিকা দ্বিভুজা বালিকা এ যে দশভুজা ভুবনমোহিনী।"

আগমনী পদগুলিতে উমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকা মেনকা যেন সমগ্র বাঙালি সমাজের মায়েদের প্রতিনিধিত্ব করছেন ।এ যেন কোন এক বিশেষ যুগের রচিত মেনকা চরিত্র নন।শাক্ত পদাবলীর মেনকার মধ্যে সাধারন গৃহস্থ বাঙালি মায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টতই ফুটে ওঠে।মেয়ের প্রতি স্নেহ,মমতা, ভালবাসায় পরিপূর্ণ মেনকা । তাই বালিকা উমার ঘুম সম্পর্কে তিনি সচেতন-

"আর জাগাস নে মা জয়া অবোধ অভয়া

কত করে উমা এই ঘুমাল।

উমা জাগিলে একবার ঘুম পাড়ানো ভার,

মায়ের চঞ্চল স্বভাব চিরকাল।"

আগমনী পদগুলির আরেকটি বিশেষ দিক হল গিরিরাজের প্রতি মেনকার অভিযোগ।এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর উমার আগমনের সময় উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও গিরিরাজের উদাসীনতা মেনকার মনে অভিমানের সৃষ্টি করে –

"গিরি,একি তব বিবেচনা,

গেল সম্বৎসর হয় না অবসর

গৌরী আনার কথা মনে তো হল না ।"

নেশাগ্রস্ত হয়ে অহর্নিশ শ্মশানে-মশানে বিচরন করা এবং সংসারের প্রতি খেয়াল না রাখা জামাইয়ের প্রতি শাশুড়ির ভৎর্সনা বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের পরিচিত ছবি।তাই শিবের প্রতি মেনকার প্রতিটি বিরূপ মন্তব্যকে বাঙালি পাঠক অমূলক বলে উড়িয়ে দিতে পারেনি।তাই শিব বাঙালির উপাস্য হলেও শাক্ত পদাবলীতে বাঙালি পাঠক মেনকার প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে থাকতে পারে না ,কারন বিশেষত বাঙালি মায়েদের চিন্তা,ভাবনা, মানসিকতার সাথে মেনকা চরিত্রটি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত –

"এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না ।

আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ কারোর কথা শুনব না।। "

শাক্ত পদাবলীর আগমনী পর্যায়ের পদগুলিতে লোকাচারের বাহুল্য থাকলেও ভক্তিভাব কোন অংশে খর্ব হয়নি। প্রাচীনকাল থেকেই বাৎসল্যভাবের প্রতি বাড়ির মায়েদের বিশেষ আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয় । বৈষ্ণব পদাবলীর মা যশোধাকে যেমন আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত করে বাংলার ঘরে ঘরে নিত্য গোপালসেবা হয় , তেমনই মা মেনকাকে অনুসরন করেই বছরের পর বছর বাঙালি দুর্গোৎসব পালনে ব্রতী হয় ,এবং উৎসব সমাপনান্তে একবছর পুনরায় উমার আগমনের অপেক্ষায় রত থাকে ।

বাংলা সাহিত্যে শাক্ত পদাবলী হল অমূল্য সম্পদ।দেবী ভগবতীকে শাস্ত্রের সুকঠিন তত্ত্ব দ্বারা বিশ্লেষণ করলে অনেক সময় তা হৃদয়ঙ্গম করা দু:সাধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ঈশ্বরকে কন্যা বা মাতৃস্থানীয় করে হৃদয়মন্দিরে উপবেশন করালে সম্পর্কটা অনেকাংশে আন্তরিক হয়ে ওঠে।ভক্তের এই সরলতা,আন্তরিকতায় শাস্ত্রের বহু কঠিন তত্ত্বও সরলরূপে প্রতিভাত হয় ।তাই যুগে যুগে মহাপুরুষগণ শিশুর মত সারল্যকেই ভগবৎচরনে আত্মনিবেদনের সহজ পন্থা হিসেবে নির্দেশ করেছেন।বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ শাক্তপদাবলীর পদগুলিতে সেই অকপট সরলতারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।কালক্রমে ঈশ্বরের প্রতি অকপট ভালবাসার চিত্র লুপ্ত হতে চলেছে।থিমপূজা বাঙালির জীবনে বৈচিত্র্য এনেছে অস্বীকার করা যায় না । কিন্তু থিমপূজাকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতায় মশগুল বাঙালি দুর্গোৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্যকেই ভুলতে বসেছে। অষ্টমীর সকালে মাতৃচরনে পুষ্পাঞ্জলি পড়ে ঠিকই,কিন্তু ভক্তের প্রকৃত অঞ্জলি দেহ,মন,প্রাণ পড়ে থাকে বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় কিংবা হোটেল-রেস্তোরাঁয়। সন্ধিপূজায় চামুন্ডাশক্তিরূপে দেবীকে জাগ্রত করার প্রয়াস সকলেই করে , কিন্তু আত্মশক্তিকে জাগ্রত করার প্রয়াসী মানুষজনের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। জাঁকজমকপূর্ণ ছাগবলি আজও অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু ষড়রিপুকে বলি দিতে সক্ষম মানুষ আজ বিরল।

বাংলার দুর্গোৎসবকে প্রানবন্ত করে তুলতে রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ,তারাচাঁদ রায় ,দাশরথি রায় প্রমুখ শাক্তপদকর্তাদের আদর্শ হিসেবে সামনে রাখা একান্ত প্রয়োজন।তাদের পাথেয় করে বাংলার দুর্গোৎসব হয়ে উঠুক মিলন উৎসব । মহাশক্তির আরাধনায় ব্রতী হয়ে বাঙালি অন্তরে নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে তুলুক।তবেই বাঙালির দুর্গোৎসব সার্থক হয়ে উঠবে । বাঙালি অন্তরাকাশে অনুধাবন করবে মায়ের আগমনীর আলো।

—সুকল্যাণ মুখার্জী

৪ নং বেড

আকস্মিক কারুর কথা বলার শব্দ।ঘুমটা ভেঙে গেল! নাইট ল্যাম্পের আলোটা অন্ধকারে গ্রাস করা ঘরটাকে একচিলতেও আলোকিত করতে পারেনি। শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখলাম পাশে কেউ দাঁড়িয়ে। নাইট ল্যাম্পের সবুজ আলোতে ঝাপসা।বুঝলাম তার পোশাকটাও আমার মতো অর্থাৎ _____

জিজ্ঞাসা করলাম ' কে '?

উত্তর এল না।

আবার বললাম 'কে'? 'কী চাই?'

উওর এল না। শুধু একটা হাত আমার বেডের পাশের টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল।

এমন সময় টিউব লাইটটা জ্বলে উঠল।

নার্স কেবিনে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল

"ঘুমাননি এখানো? নিন আপনার ঔষধ"।

কেবিনের মধ্যে আমি, নার্স ছাড়া তৃতীয় ব্যাক্তি র অস্তিত্ব খুঁজে পেলাম না। নার্স চলে যাবার পর ঘুমানোর চেষ্টা করছি,কানে একটা ক্ষীণ স্বর ভেসে এল, কেউ ফিসফিস করে বলছে "জল খাবো।"

সায়ন্তনী দাস,তৃতীয় সেমিস্টার

ক্ষীরের পুতুল

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ কে বলেছিলেন, "অবন,তুমি লেখো না, যেমন করে মুখে মুখে গল্প করে শোনাও তেমন করেই লেখো।" অবনীন্দ্রনাথ এতে উৎসাহিত হয়ে প্রথম লিখেছিলেন "শকুন্তলা"। এরপর ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর রূপকথাধর্মী গ্রন্থ "ক্ষীরের পুতুল।"

বাংলা শিশুসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ক্ষীরের পুতুল"। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর তার ডায়েরি থেকে একটি গল্পের প্লট পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এরপর নিজের মতো করে লিখে তিনি এই রূপকথাধর্মী কাহিনীটির জন্ম দেন। পরবর্তী সময়ে ইংরেজি, ফরাসি, হিন্দি, মারাঠি সহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় "ক্ষীরের পুতুল"।

মৌসুমী পল্লে

এক রাজার দুই রানী দুও আর সুও। রাজবাড়িতে সুওরানীর কত আদর যত্ন, সাতশো দাসী তার সেবা করে। রাজার একেবারে প্রাণ সুওরাণী আর দুওরানী বড়োরানী তার বড়ো অনাদর, বড়ো অযত্ন। রাজা বড়োরানীকে বিষ চোখে দেখেন। একখানি ঘর দিয়েছেন ভাঙাচোরা, এক দাসী দিয়েছেন বোবা -কালা।
রাজা একদিন দেশ-বিদেশ ভ্রমণে বের হওয়ার জন্য জাহাজ সাজাতে রাজমন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন। বিদায় নেওয়ার আগে সুওরাণী আর দুওরানীর সাথে পথে দেখা করে রাজা জানতে চাইলেন কার কি প্রয়োজন। সুওরানী সাথে সাথে আটগাছা মানিকের চুড়ি,সোনার দশগাছা মল,পায়রার ডিমের মতো মুক্তার হার,জলের মতো চিকন শাড়ি চেয়ে বসলেন। এদিকে দুয়োরানীর কাছে জানতে চাইলে "রাজা ভালোয় ভালোয় ফিরুক" তিনি শুধু এই কামনা করলেন। তারপর রাজা যখন জোর করে কিছু চাইতে বললেন, তখন তিনি একটা বানর আনতে বললেন। দীর্ঘ ছয় মাস দেশ-বিদেশ ঘুরে ফিরে এলেন। ছোটরাণীকে তাঁর জন্য আনা সকল উপহার দিলেন। কিন্তু কোনো কিছু তার মন মতো হয়নি। রাগে অভিমানে সুওরাণী দরজায় খিল দিলেন। আর বড়রানী দুওরাণী পোড়ামুখো বানরকে মহানন্দে গ্রহণ করলেন। লালন পালন করতে লাগলেন তাকে। দুওরানির পুত্র সে। সেই বানরটি কিভাবে দূর করল দুওরাণীর দুঃখ তা নিয়েই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন "ক্ষীরের পুতুল"।

সময় এবং সমাজের প্রচলিত ধারণাকে উত্তীর্ণ করার সক্ষমতা রূপকথায় খুব বেশি দেখা যায় না। ক্ষীরের পুতুলে সময় ও সমাজে বহিঃপ্রকাশ ঘটে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রাবল্যে। ঠাকুমার ঝুলির রূপকথাগুলোর মত এখানেও রাজার স্ত্রীর সংখ্যা অধিক। পুরো গল্পটি জুড়ে দুওরাণীর প্রতি রাজা চরম উদাসীনতা ও অবহেলা দেখিয়েছেন এবং তাঁকে রেখে সুওরানী কে বিয়ে করেছেন। তবে রাজার এই স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ তো রচিত হয়নি,বরং এটাকে দেখানো হয়েছে খুব স্বাভাবিক রূপে, যেন এটাই নিয়ম।
কাজেই পুরুষতান্ত্রিকতা কাছে বশ্যতা স্বীকার করে এখানে যে দ্বন্দ্বটি সৃষ্টি হয়েছে তা হল- নারীর বিরুদ্ধে নারী। সুওরানী দুওরাণীর বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ এবং প্রতিশোধস্পৃহা প্রবল। তাঁর এই খারাপ গুণগুলোর কাছে রাজা এবং দুওরানী দুজনে কাবু দেখা যায়। দুওরাণীর সন্তান ধারণের সম্ভাবনার কথা জানতে পেরে সুওরানী তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করতে দ্বিধা করে না। কাজেই নারীর বিরুদ্ধে নারীর এমন হিংসাত্মক মনোভাবের বিবরণ শিশুদের মনে কতটুকু ইতিবাচক সৃষ্টি করবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

কথা বলতে সক্ষম বুদ্ধিমান বানরটিকে দেখা যায়, একের পর এক মিথ্যে বলে রাজার কাছ থেকে দুওরাণীর জন্য নানা রূপ সুবিধা আদায় করতে। নিঃশঙ্কচিত্তে এবং নির্দ্বিধায় অনবরত মিথ্যে কথা বলা কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়েও প্রশ্ন থেকেই যায়।

" ক্ষীরের পুতুল" হয়তো বা সরল মনে শিশুরা পড়ে যাবে। কল্পনার রাজ্যে ঘোরার সময় ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধ হবে, তবে গল্পের মূলে যে বাণী প্রোথিত আছে, তা শিশুমনে কতটুকু ইতিবাচকতা জন্ম দেবে, তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে বা এমনও হতে পারে রূপকথা গুলি এভাবেই সত্যিকারের কঠিন পৃথিবীর জন্য শিশুদেরকে তৈরি করে দেবে।

অর্পিতা দাস, পঞ্চম সেমিস্টার

অ্যাসাইলাম :

আজকের সকালটা অন্যান্য দিনের থেকে অনেকটা আলাদা। সকাল থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আর এইদিকে প্রীতি নিখোঁজ, সকাল থেকে ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রুম নম্বর বারোর পেসেন্টটা আজ হঠাৎই ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছে, তাকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছেনা। প্রীতি গেছে আর্যকে ডাকতে, আর্য এই অ্যাসাইলামের ডাক্তার। ও হ্যাঁ আপনাদের বলাই হয়নি প্রীতি হল আমার সহকর্মী,আমরা দুজনেই একসঙ্গে ছিলাম সেখানে আর তারপর সবটা কেমন ঘেঁটে গেল। অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় আমি নিজেই ওকে খুঁজতে গেলাম। খুঁজতে খুঁজতে আমি হসপিটালের দোতলার উত্তর দিকটায় চলে যাই। সেখানে গিয়ে হঠাৎই চোখে পরে দেওয়ালে নখের আঁচড় আর মেঝেতে পরে থাকা রক্তের উপর ।তার একটু দূরে চোখটা যেতেই দেখি বাঁদিকের জানালার উপর রিয়া বসে আছে হাতে ছুঁড়ি নিয়ে। টকটকে লাল দুটো ঘোলাটে চোখ আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে । কোঠারের অনেকটা ভিতরে ঢুকে যাওয়া চোখগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে যেন একটা আগুনের আভা।ওকে দেখা মাত্রই আমার বুকের ভিতরটা এক মুহূর্তের জন্য কেমন যেন শুকিয়ে এলো, কী করবো বুঝতে না পেরে নিজেকে একটু সংবরণ করে কাঁপা-কাঁপা পায়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। ততক্ষণে দেখি ওর চোখ-মুখে তীব্র রাগের চাহনির বদলে একটা অমায়িক দৃষ্টি। তার চোখদু'টো জলে ভরে আছে। সে আমার দিকে খুব স্নেহশীলভাবে দেখছে, তার চোখ দুটো যেন কিছু বলতে চায়। ওর একটু কাছে গিয়ে প্রীতির কথা জিজ্ঞাসা করায় সে আমায় মেঝের উপর পড়ে থাকা ওই রক্তের দিকে ঈঙ্গিত করলো। আমার চমকে ওঠায় সে পরক্ষণে হা হা করে তারস্বরে হেসে উঠলো। চারিদিকে একটা শ্বাসরোধকারী নিস্তব্ধতা, তার হাসির আওয়াজে গোটা ঘরটা যেন কেঁপে উঠে গিলে খেতে চাইছে আমাকে।

আজ থেকে ঠিক একটা বছর আগের ঘটনা। দিনটা ছিল আজকের তারিখ, ষোলোই আগস্ট, শনিবার। সেইদিন রাতে ওর দিদির সাথে একটা তুমুল অশান্তি হয়। রাগের বশবর্তী হয়ে ধারালো ছুরি দিয়ে গলার নলি কেটে নিজের দিদিকে খুন করেছিল রিয়া। সে এক ভয়ংকর ঘটনা।এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়, তা বুঝতে পারিনি। পাঁচঘন্টা কেটে গেল এখনো পযর্ন্ত প্রীতির কোনো খোঁজ মিললো না। ঘড়িতে তখন সময় আটটা পনেরো, হঠাৎই অ্যাসাইলামের একটা ওয়ার্ড বয় এসে বলে, দু'তলায় উত্তরদিকে বারো নম্বর রুমের ঠিক পিছনের দিকে বারান্দায় একটা লাশ পাওয়া গেছে।

মেঘা পাত্র, তৃতীয় সেমিস্টার

◦ জাদুকথা ◦

ম্যাজিক [illegible] মধ্যে রহস্য উন্মোচন হয় । আমার ছোট্ট বেলায় স্কুলে ম্যাজিক দেখেছি একজন পাগড়ি পরে ও রাজপোশাক পরে একের পর এক রহস্য সৃষ্টি করে চলছে। আমাদের চোখের সামনে টুপি থেকে পায়রা আবার ম্যাজিক ঝুলি থেকে কখনো ফুল আর ও কত কী অভাবনীয় রহস্য তৈরি করেছে যার রহস্য ভেদ করা অসম্ভব। ম্যাজিক হল যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, যার রহস্য ভেদ হওয়ার নয় কিন্তু ম্যাজিক এর মধ্যে প্রবেশ করলে আমরা জাদুর রুপ, গন্ধ, অনুভব করতে পারি। এরকমই এক জন উল্লেখযোগ্য জাদুকর হল গনপতি চক্রবর্তী । তিনি ১৮৫৮ সালে হাওড়া জেলার সালকিয়া শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম থেকেই তিনি লেখা পড়ার থেকে রহস্যময় জ্ঞান,ও অতিপ্রাকৃত নিরাময় শেখার জন্য বিভিন্ন সন্ন্যাসী ও জাদু শেখার জন্য খেষ্টপাল বসাক ও জহরলাল ধরের মতো আরও অনেক জাদুকরের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় সার্কাস এ কমেডিয়ান হিসাবে। তারপর তিনি আবিষ্কার করেন “ইলিউশন বক্স” ও “ইলিউশন ট্রি যা দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। এরপর তিনি বিভিন্ন কৌশল দেখান যা দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়।মড়ার খুলি উড়ে এসে গনপতির মুখ থেকে সিগারেটে খেতো, চেয়ার, টেবিল শূন্যে ভাসছে যা দেখে মানুষ এর চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত। তাঁর ছুঁচালো গোঁফ , মাথার সরু টিকি ও হাঁটুর ওপর পরা ধুতি গনপতি কে দেখে অনেকেই ভাবতন তিনি বোধহয় রহস্যকর, অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তিনি এভাবে মন জয় করেন অনেক মানুষের। তাঁর বিখ্যাত কৌশল “কংশ কারাগার”। তাঁর জাদুর জীবনে সাক্ষাৎ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত প্রসিদ্ধ ভৌতিক খেলা শুরু হওয়ার আগে তিনি ভালো ভাবে পরীক্ষা করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জাদু দেখার পর রোমাঞ্চকতার শিকার হন। আবার একজন তাকে বলে টাকা তৈরির ম্যাজিক শেখাতে কারণ তার মেয়ের বিয়ে টাকার অভাবে আটকে গেছে । গনপতি চক্রবর্তী ম্যাজিক না শেখালেও তার মেয়ের বিয়ে দায়িত্ব নেন। তিনি জাদু প্রদর্শন করে অনেক মান -সম্মান অর্জন করেন। তিনি শেষ জীবন সাধন-ভজন করে অতিবাহিত করেন। তিনি নিজের একটি মন্দির তৈরি করেন। তাঁর তৈরি মন্দিরের রাধাগোবিন্দ মূর্তি কে ধরে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন, সেই দিনটা ছিল ২০ নভেম্বর ১৯৩৯ সাল। জীবনের মতো মৃত্যু ও ছিল অবিশ্বাস্য। তাঁর হাত ধরেই এসেছে বিখ্যাত জাদুকররা প্রথম জন প্রতুল চন্দ্র রায় (পি.সি সরকার), দ্বিতীয় জন দুলাল চন্দ্র রায় (ডি.সি),দেবকুমার ঘোষাল বা জাদুসূর্য দেবকুমার আর ও অনেকে। গনপতি চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণায় জন্ম নেবে আরও অনেক জাদুকর,যারা তাদের কৌশল দিয়ে রহস্য তৈরি করবে।যাদু আমাদের গর্ব কারণ এটা আমাদের নিজেদের ভারতীয় কলা। গনপতি চক্রবর্তী কে নিয়ে লেখা হল “যাদুবিদ্যা”। গনপতি চক্রবর্তী কে বলা হয় ভারতের আধুনিক "যাদুবিদ্যার পথিকৃৎ"।

শুভাংকৃতা সিংহ রায়, তৃতীয় সেমিস্টার

।।।।। বাংলা সিনেমায় সত্যজিৎ রায় ।।।।।

সত্যজিৎ রায় ভারতীয় তথা বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এমন একটি নাম যিনি বাংলা সিনেমাকে আঞ্চলিকতার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র জাতীয় স্তরে নয় আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই পর্বে আমরা সেই মহান মানুষটিকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে চেনার একটু চেষ্টা করব। সত্যজিৎ রায় শুধুমাত্র একজন পরিচালক বা উপন্যাসিক নন, তার ভিন্ন প্রতিভার পরিচয় আমরা পাই একজন স্ক্রিপ্ট রাইটার, সুরকার, গীতিকার, চিত্রশিল্পী এবং একজন লেখক হিসাবে।

ভারতীয় সিনেমায় তার আগমন কিছুটা কাকতালীয় নয়। সত্যজিৎ রায়ের পূর্বসূরিরা কেউ সিনেমা জগৎ এ না আসলেও দাদু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও বাবা সুকুমার রায় এর ক্যামেরার প্রতি আগ্রহ ছিল অপরিসীম। ছবি তোলার বহু কলাকৌশল বিদেশেও স্বীকৃত হয়েছে। পিতৃহারা সত্যজিৎ মায়ের ইচ্ছায় বিশ্বভারতীতে ভর্তি হন এবং বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বিনোদ বিহারী মুখার্জীর কাছ থেকে অঙ্কন শিক্ষা করেছিলেন। তার এই অন্ধ শিক্ষকের ওপর পরবর্তীকালে "অন্তর্দৃষ্টি" (the inner eye) নামক সিনেমাটি প্রযোজনা করেন। পরবর্তীকালে চাকরির সূত্রে তিনি ইংল্যান্ড এ গেলে সেখানে বিদেশী চলচ্চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কোথাও একটা চলচ্চিত্র নির্মান এর সুপ্ত বাসনা তার মধ্যে তৈরি হয়। এই সময় যে চলচ্চিত্র তিনি দেখেছিলেন তার মধ্যে তার একটি অত্যন্ত পছন্দের সিনেমা ছিল "The Bicycle Thieves" সিনেমাটি।তিনি যখন কলকাতায় ফিরলেন সেই সময় বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক জ্যাঁ রেণর (Jean Renoir) তার ছবি "The River" এর জন্যে লোকেশন খুঁজছিলেন। সত্যজিৎ রায় তাকে সাহায্য করেছিলেন লোকেশন খুঁজতে। এই লোকেশন খুঁজতে খুঁজতে তিনি খুঁজে পেলেন তার নিজের সিনেমার লোকেশন।

"পথের পাঁচালী" উপন্যাসকে ছোটদের জন্য *আম আঁটির ভেঁপু* সংস্করণে পরিবর্তন করার সময় থেকে এই উপন্যাসটির চলচ্চিত্র রূপ নিয়ে তিনি ভাবনা চিন্তা শুরু করেছিলেন। ১৯৫২ সালে এই উপন্যাসটিকে সিনেমার রূপ দেওয়ার কাজ শুরু করলেন। যা কিন্তু খুব সহজে হয়নি। আমরা সকলেই এটা জানি যখন আগের দিন কাশ ফুল ভর্তি মাঠ দেখে আসার পর পরেরদিন গিয়ে দেখেছেন গবাদি পশুতে সব কাশ ফুল খেয়ে ফেলেছে। বাংলা চলচ্চিত্র প্রেমীদের মনে কাশ ফুল এর মাঠ দিয়ে অপু দুর্গার রেলগাড়ি দেখতে যাওয়া একটি সুন্দর দৃশ্য। এই শুটিংটার জন্য পরিচালক সত্যজিৎ কে দীর্ঘ এক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তিনি অন্য কোনো নতুন পরিচালকের মতো কাজ সমাধানের জন্য অন্য জায়গা খুঁজতে যাননি। আসলে সিনেমার প্রতি তার নিষ্ঠাই তাকে অন্য কোথাও যেতে দেয়নি।

তিনি চরিত্র শিল্পী নির্বাচনেও ব্যাতিক্রমী চিন্তা ধারণ করতেন। ইন্দিরা ঠাকুরনের চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছিলেন সেই তিরানব্বই বছরের চুনিবালা দেবীকে তিনি পতিতালয় থেকে খুঁজে এনেছিলেন। তিনি এক জায়গায় বলেছিলেন শিল্পী খুঁজে বের করতে তিনি ভালোবাসেন। চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ আসলে নিজের মনে যেকোনো চরিত্রের ছবিটা আগে এঁকেনিতেন। সেই কারণে চরিত্র অনুসারে নিখুঁত চরিত্র শিল্পীদের নির্বাচন করতেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সত্যজিৎ কেবল যে চিত্রশিল্পী ছিলেন তা নয় তিনি সঙ্গীতেও অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। সেই কারণেই প্রথম দিকের সিনেমা গুলিতে পণ্ডিত রবিশঙ্কর বা ওস্তাদ বিলায়েৎ খান সাহেব সুর দিলেও পরবর্তীকালে "তিনকন্যা* সিনেমা থেকে তিনি নিজেই নিজের সিনেমায় গান তৈরি ও সুর দিতে শুরু করেন। পিয়ানোয় সিদ্ধহস্ত এবং বিদেশী সঙ্গীতে পারদর্শী সত্যজিৎ রায় গান ও সুরের মাধ্যমে তার সিনেমাকে যে অন্য মাত্রা দিয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। রিয়ালিজম্ বা বাস্তবতার উপরে তিনি অতন্ত জোর দিতেন। এই কারণে কোনো নির্দিষ্ট দৃশ্যের শুটিং এর জন্য তিনি দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে পিছুপা হননি। নিজের কাজ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী সত্যজিৎ কোনোদিনই সমঝোতা করতে রাজি ছিলেন না সেটা তার প্রথম সিনেমা থেকে দেখা যায়। যে কারণে অনেকের কথা সত্ত্বেও "পথের পাঁচালী" একটি মিলনাত্মক সিনেমা হয়নি। একসময় এই সিনেমাটি তৈরী করার সময় অর্থ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল কিন্তু তাতেও সত্যজিৎ পিছুপা হননি। এবং পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সালে জাতীয় পুরস্কার এবং কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ প্রদর্শন সিনেমাটিকে অন্য পর্যায়ে উন্নীত করে।

সত্যজিৎ রায় প্রায় ৩৬ টি সিনেমা পরিচালনা করেন, তার মধ্যে তিনটি documentary film উনি রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষে প্রধানমন্ত্রী জওরলাল নেহেরু এর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের উপর একটি Documentary film প্রযোজনা ও সম্পাদনা করেন। বাঙালি তথা ভারতবাসী চিরকাল ব্যাপী এই মানুষটির কাছে চিরঋণী থাকবে কারণ উনিই সর্বপ্রথম "ভালো সিনেমা" এর স্বাদ চিনিয়েছেন। বানিজ্যিক সিনেমার প্রতিযোগিতার বাজারে আর্ট ফিল্ম তৈরি করার ধৃষ্টতা তিনি দেখাতে পেরেছিলেন বলে বাঙালি আজও প্রেক্ষাগৃহ মুখী হয় ভালো সিনেমা দেখবার উদ্দেশ্যে। সত্যজিৎ রায় আন্তর্জাতিক মানের সিনেমার যে রুচিবোধ তৈরি করেছিলেন তার পদাঙ্ক অনুসরন করে তার সমকালীন চিত্র পরিচালকগন - ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার ভালো কাজ করার সাহস দেখাতে পেরেছিলেন যা পরবর্তীকালে অপর্ণা সেন ,ঋতুপর্ণ ঘোষ, শ্যাম বেনেগাল, গৌতম ঘোষ বা মকবুল ফিদা হুসেন এর মত পরিচালকগণ আর্ট ফিল্ম বানিয়ে সিনেমাপ্রেমী অজস্র শ্রোতাকে এক অকৃত্রিম বিনোদনের ব্যাবস্থা করছেন।

রাহুল ঘোষ, তৃতীয় সেমিস্টার

::::::::----------::----------::::::::

"বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত"

রবীন্দ্রস্বভাবের বিপরীতে সমাজকে শান্ত করার উদ্দেশ্যেই বিদ্রোহীর ভূমিকা নিয়েছিলেন স্বয়ং কবি নজরুল। কবিতার লাইনগুলো পাঠ করলে বা শুনলেই যেন বুকের ভিতরের রক্তস্রোত তীব্র ক্ষরিত হয়। প্রায় একশো বছর পরও সেই মহিমা যেন কোনোভাবেই ক্ষীণতর নয় বরং আরও প্রবল হয়ে ওঠে লোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। জানা যায়, ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের এক বৃষ্টিমুখর রাতে লেখা হয়েছিল নজরুলের 'বিদ্রোহী ' কবিতাটি। কবির অনুভূতি ও শব্দের আঁচড়ের সাথে পাল্লা দিতে পারেনি দোয়াতের কালিও। সে কারণে পেন্সিলেই শেষ হয় কবিতাটির রচনা। ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে 'বিজলি'পত্রিকায় লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই তুমুল আলোড়িত হয় কবিতাটি ।পরবর্তীতে 'প্রবাসী' ,'সাধনা' প্রভৃতি পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল কবিতাটি।আমিও প্রথমবার নজরুলের 'সঞ্চিতা' কাব্যগ্রন্থটি হাতে পাওয়ার পর কবিতাটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। এত তেজ এ যেন বিদ্রোহী কবির বিদ্রোহেরই রূপ। যেন নিঃশব্দ কলমের কয়েকটি শব্দের মধ্যেই ঘটে যায় এক বিরাট বিদ্রোহের বিস্তার। দৃপ্ত বিদ্রোহী মানসিকতা এবং অসাধারণ শব্দবিন্যাস ও ছন্দের জন্য আজও বাঙালিমানসে কবিতাটি 'চির উন্নত শির'।

দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে যে বিপ্লব নজরুল তাঁর রক্তের মধ্যে অনুভব করেছেন তার মূল্যায়নেই সবকিছু ভেঙে নতুন করে গড়ার প্রেরণা জুগিয়েছে এই জ্বালাময়ী কবিতা 'বিদ্রোহী '। এই অনুভূতির যেন কোনো আভিজাত্য নেই। যারা অত্যাচারিত, যাদের
বলার কোনো ভাষা ছিল না, নজরুলের কলমে তারা যেন ভাষা খুঁজে নেন - এ যেন সেইসব মানুষদের বাঁচার প্রেরণা, নতুন প্রাণশক্তি। তীক্ষ্ম শব্দবিন্যাস, প্রতিবাদী ভাবমূর্তি, বিদ্রোহী চেতনা রাতারাতি কবিকে যেন কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে দিয়েছিল মানুষের দরবারে। নিজেকে 'চিরদুর্দ্দম,দুর্বিনীত ,এলোকেশে ঝড়' এর মতো অভিধায় অভিষিক্ত করেছেন কবি। তাঁর কবিতায় ছিল না কোনো জাতবিচারের অভিপ্রায়। ফলে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি যে জাতির আত্মমুক্তির মন্ত্র হিসেবে উচ্চারিত, সে কবিতাটিই ওই জাতিরই কয়েকজন ধর্মান্ধের গাত্রদাহের কারণও হয়ে ওঠে। তবুও কলম থামেনি কবির ,অনুভূতির অনুরণন সর্বদা লিখে গেছেন কবি।

চরম অবিন্যস্ততার মধ্যে যে সৃষ্টির কাজ অবিরত 'বিদ্রোহী'-র শুরুর স্তবক তারই সাক্ষ্যবহ । মানবজীবনের প্রেম,ভালোবাসা, ঘৃণা,আশা-হতাশা,অস্থিরতা, বৈষম্য সবই প্রকাশিত এই কবিতায়।প্রকৃতির প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কবি,বিধাতার প্রতিও ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তিনি। দেখা যায়, তীব্র অগ্নিদাহনের শেষে শান্তিপ্রতিষ্ঠার আমেজ নেমে আসে কবিকণ্ঠে। এ যেন সাধারণ 'আমি' থেকে 'বিশেষ আমি'-তে উত্তরণের চেষ্টা। সচেতনভাবে সুরের ইন্দ্রজালে ও যৌক্তিকতায় বাঙালির আত্মজাগরণের মূলমন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে 'বিদ্রোহী' যেন সমগ্র বাঙালি জাতির আবেগের জায়গায় তীব্র আঘাত দেয়। এভাবে একটি জাতির বিশুদ্ধ আবেগকে আত্মীকরণ করে কবিতাটি হয়ে ওঠে জাতির আত্মজাগরণের মন্ত্র ।শতবর্ষ পরেও যার প্রাসঙ্গিকতা এতটুকুও কমেনি। তাই প্রণম্য কবির প্রতি আমার নিবেদন,

'বিদ্রোহী তুমি ওগো কবিবর
বিদ্রোহী তুমি মনমাঝে
তোমার শব্দের ফুৎকার যেন
আমার দর্পণে এসে বাজে'।।